দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় সার্লীয় উদ্ভবতত্ত্ব
ও
তার বিকল্পের অনুসন্ধান

(সংক্ষিপ্তসার)

সৌতি বসু

পি এইচ ডি রেজিঃ নং : ০০১৬০০৯০৬০০৬

পি এইচ ডি উপাধিপ্রাপ্তির আবশ্যিক অংশ রূপে প্রদত্ত

তত্ত্বাবধায়ক :

অধ্যাপক সৌমিত্র বসু

দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। মনোদার্শনিকরা অনুধাবন করেছেন যে, দেহ-মনের সম্বন্ধকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য মনের স্বরূপ নির্ধারণ করা আবশ্যিক। তাই তাঁরা মনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে মনোনিবেশ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে দেহ-মনের সম্বন্ধ দার্শনিক জগতে যেভাবে আলোচিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হয়েছে। মন বা চেতনাকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মনোদার্শনিকরা মূলতঃ দুটি ভাগে বিভক্তঃ- দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদে জগতে জড় ও মন নামক দুটি সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও, অদ্বৈতবাদীরা একটি সত্ত্বার অস্তিত্বই স্বীকার করতে আগ্রহী। অদ্বৈতবাদ আবার দু'ধরনের — জড়বাদ ও সর্বমনবাদ। জড়বাদ কেবলমাত্র জড় বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করতে চায়। জড় অতিরিক্ত কোনো সত্তার অস্তিত্ব এই তত্ত্বে স্বীকৃত নয়। জড় ভিন্ন সবকিছুকেই এই তত্ত্ব জড় জগতে পর্যবসিত করার পক্ষপাতী। সর্বমনবাদ আবার এই জগতের সব বিষয়ের মধ্যে চেতনার অস্তিত্ব আছে বলে মনে করে। তাঁদের মতে, জগতের সব বিষয়ের মধ্যেই চেতনার উপস্থিতি আছে, জগতের সবকিছুই কোনো না কোনোভাবে চেতন — একথা প্রতিষ্ঠা করতে একটু অসুবিধা হয় বলে, সর্বমনবাদ দার্শনিক মহলে খুব বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। তাছাড়া সর্বমনবাদ বিবর্তনের পদ্ধতিকেও অস্বীকার করে। এই জগতে যা কিছুর উৎপত্তি হয়েছে, তার সবই সংশ্লিষ্ট উপাদান কারণে আগে থেকে উপস্থিত ছিল, একথা বলা যায় না। বিবর্তনের ধারার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, প্রথম যুগে শুধু জড়পদার্থই ছিল অর্থাৎ যাতে চেতনার অস্তিত্ব প্রকাশ পেত না। তার পরবর্তী একটি কালে প্রাণের সঞ্চার হল। তারও অনেক পরে, প্রাণের সঙ্গে বংশগতির সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ নতুন বস্তুর উদ্ভব হল — চেতনা, যা সম্পূর্ণ নতুন একটি বৈশিষ্ট্য জগতে নিয়ে এলো। এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা জগতে আগে কখনো কোনো বস্তুতে ছিল না। এই নতুন আবির্ভাব বা উদ্ভবকে সর্বমনবাদ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

কার্তেসীয় দ্বৈতবাদ দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে। দেহ ও মনের মধ্যে উভমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধের মাধ্যমে এই দুটি স্বতন্ত্র জগত পরস্পরকে প্রভাবিত করে বলে কার্তেসীয় তত্ত্বে মনে করা হয়েছে। দেকার্ত দেহ বা জড় জগতকে বিস্তৃতিযুক্ত ও মনকে বিস্তৃতিহীন রূপে গণ্য করেছিলেন। এই দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্ট দ্রব্য কীভাবে একে অন্যের উপর ক্রিয়া করতে পারে-তা তিনি ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হননি। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা কার্তেসীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদকে সমর্থন করে ঠিকই, কিন্তু যৌক্তিকভাবে বা তত্ত্বগত দিক থেকে এই কার্যকারণ সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করা সমস্যাজনক বলেই মনে হয়। তাছাড়া দেকার্ত কার্যকারণ সম্বন্ধকে যেভাবে যান্ত্রিক সম্বন্ধ হিসেবে বুঝেছেন তাও সমস্যাজনক।

কার্তেসীয় দ্বৈতবাদ দুটি পরস্পর স্বতন্ত্র দ্রব্য স্বীকার করে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। কিন্তু পদার্থ যদি 'দুটি' নাই থাকে তাহলে তাদের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার সমস্যাই আর থাকে না। জড়বাদ এই চিন্তারই ফসল। জড়বাদী বিভিন্ন তত্ত্বে মনকে জড় জগতে পর্যবসিত করা হয়েছে, ফলে দেহ-মনের সমস্যা ব্যাখ্যার প্রসঙ্গই বিলীন হয়ে গেছে। উপবস্তুবাদ অবশ্য মনকে অস্বীকার করে জড় জগতে পর্যবসিত করতে চায় না। দেহ বা ভৌত জগত অতিরিক্ত মনের অস্তিত্ব সেখানে স্বীকৃত হলেও দ্বৈতবাদের মতো এই তত্ত্বে দেহ-মনের মধ্যে উভমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় না। এই তথ্য একমুখী কার্যকারণ তত্ত্বের কথা বলে। উপবস্তুবাদ মানস ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও মানস দশার কোনো অর্থক্রিয়াকারিত্ব (কারণিক ভূমিকা) স্বীকার করে না। মানস ঘটনা এই তত্ত্ব অনুসারে উপবস্তু। কিন্তু বিবর্তনের ধারার দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে এই জগতে সেইসব বস্তুগুলিই প্রাকৃতিক নির্বাচন পেয়েছে, যেগুলি নিজেদের কার্যকরী রূপে প্রমাণ করতে পেরেছে। মনের যদি কোনো কার্যকারিতা না থাকত, তাহলে তা কখনোই প্রাকৃতিক নির্বাচন লাভ করতে পারত না। অন্যদিকে আচরণবাদ আবার মনের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চায়নি। মানব আচরণের অতিরিক্ত 'মন' বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব এই তত্ত্বে স্বীকৃত নয়। জগত শুধুমাত্র জড়বস্তুর সমাহার; এই জগতের যাবতীয় বৈচিত্র্যের জড় ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। তাই মন বা চেতনার মতো অজড় কোনো পদার্থের উপস্থিতি আচরণবাদের মতো চরম জড়বাদী তত্ত্বে স্বীকার করা একেবারেই অনাবশ্যক।

এখন, জগত যদি শুধুমাত্র জড়বস্তুর সমাহার হয়, তাহলে জগতের সৃষ্টিশীলতার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। জগত নিজেই প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছে। তার থেকে মনের বা চেতনার উন্মেষ হয়েছে। এই চেতনা জগতকে তার মতো করে প্রতিফলিত করে, প্রতিভাত করে। আবার, কখনো কখনো সে নিজেই সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে। এ জগতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা কেবলমাত্র জড় জগত দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিছু ঘটনাকে বিশেষতঃ মানস জগতের বিভিন্ন ঘটনাকে লক্ষ করলে মনে হয় যে সেগুলি কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য করা হয়েছে। জড়জগতের সাহায্যে যার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

আচরণবাদ মনের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও অন্যান্য জড়বাদী অনেক তত্ত্বই কিন্তু মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। দেহ-মনের অভেদতত্ত্ব তাদের মধ্যে অন্যতম। অভেদতত্ত্বে দৈহিক দশার পাশাপাশি মানস দশার অস্তিত্বও স্বীকৃত। দৈহিক দশা অতিরিক্তভাবে মানস দশার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও, মানস দশাকে দৈহিক দশা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দশা হিসেবে অভেদবাদীরা গণ্য করেন না। তাঁদের মতে জড় ও মন -- দুটি ভিন্ন জাতীয় বিষয় নয়, এই দুটিই জড়জগতের অংশ। অর্থাৎ

লৌকিক অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যার জন্য চেতনার অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও চেতন দশাকে তাঁরা ভৌত দশায় পর্যবসিত করারই পক্ষপাতী।

দ্বৈতবাদ এবং উপবস্তুবাদ মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানলেও দ্বৈতবাদের মতো উপবস্তুবাদ মনের স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করে না। আচরনবাদ তো মনই স্বীকার করে না। অভেদতত্ত্ব মন স্বীকার করলেও, মনকে জড়দেহেই পর্যাবসিত করতে চায়। কিন্তু দেহ-মনের সম্বন্ধকে যদি ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়। মনের স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকাও স্বীকার করা প্রয়োজন। এখন, এক্ষেত্রে দুটি সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রথমতঃ, জড় অতিরিক্ত মন যদি স্বীকার করা হয়, তাহলে তা’ কেমন হবে? তা কি দেহযন্ত্রে প্রেতাত্মার মতো কোনো বস্তু হিসেবে বিবেচিত হবে? কারণ দেকার্ত মনকে বিস্তৃতিহীন অজড় দ্রব্য হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। জড়জগতের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করা সেখানে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, মনের যদি স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করা হয়, তাহলে পদার্থবিজ্ঞানে স্বীকৃত কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি লঙ্ঘিত হয়। কোনো ঘটনাকে যদি ভৌত জগতের ঘটনার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় এবং কোনো ঘটনার কারণ রূপে যদি পর্যাপ্ত ভৌত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তার অতিরিক্ত কোনো অভৌত কারণ খোঁজা বা অভৌত কারণের সাহায্যে ঘটনাটির ব্যাখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং চেতনাকে যদি ভৌত স্নায়ুতান্ত্রিক দশা, বা তার কার্যকারিতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তাহলে অতিরিক্ত একটি মানস জগত স্বীকার করা অর্থহীন হয়ে যায়। এই কারণেই বিজ্ঞানমনস্ক জড়বাদী মনোদার্শনিকরা মনের স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করতে রাজি নন। দার্শনিক জন সার্ল চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেও বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে চেতনাকে এবং দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকেই দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করাই এই গবেষণার লক্ষ্য। তাই সার্ল কীভাবে এই জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দার্শনিক জন সার্ল (John Searle) জড়বাদ এবং দ্বৈতবাদের এই চরমপন্থী অবস্থান থেকে মনোদর্শনের আলোচনাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, উভয় তত্ত্বের কিছু কথা সত্য হলেও এদের কোনোটিই সম্পূর্ণ সত্য নয়। উভয় তত্ত্বেরই কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। দ্বৈতবাদ মনকে জড় জগতে পর্যবসিত করতে চায় না, কারণ তাহলে মনের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন হয়, যা কার্তেসীয় চিন্তার একটি অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, জড়বাদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে (scientific world view) ধরে রাখার জন্য জড় অতিরিক্ত কোনো বিষয়কেই স্বীকার করে না। কার্তেসীয় দেহ-মনের বিভাজনের তত্ত্ব এই দুটি চিন্তার মধ্যেই সুপ্তভাবে বর্তমান।

সার্ল মনে করেছেন, দেহ-মনের সম্বন্ধ সমস্যা রূপে চিহ্নিত হওয়ার মূল কারণ হল দ্বিকোটিক বিভাজনমূলক চিন্তা। তাঁর মতে, দ্বৈতবাদ এবং জড়বাদ উভয়ই এই দ্বিকোটিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। এই দুই তত্ত্বের অসুবিধাগুলি বর্জন করে যথার্থ অংশটি বেছে নেওয়াই আসল কাজ। সার্ল মনে করেন যে, জড়বাদ যখন বলে যে, "consciousness is just a brain process" (Searle 2004, 127) তখন জড়বাদ সত্য কথা বলে, অর্থাৎ এই জগতের সব বস্তুই জড়কণা বা জড়পদার্থ দিয়েই তৈরি, সব বস্তুরই জড় ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সার্লের মতে জড়বাদ যখন দাবি করে যে, সত্ত্বাগত স্তরে চেতনার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তখন সেটি সঠিক নয়। আবার, দ্বৈতবাদ যখন দাবি করে যে, "consciousness is irreducible to third person neurophysiological processes" (Searle 2004, 127) তখন সার্ল তা সঠিক বলে মেনে নেন। কিন্তু তার সঙ্গে দ্বৈতবাদীরা যখন মনে করেন যে, চেতনা এই জগতের অংশই নয়, সাধারণ ভৌতজগতের অতিরিক্ত একটি বিষয়। সার্লের মতে দ্বৈতবাদের এই দাবী মেনে নেওয়া যায় না। জড় জগত থেকে চেতনাকে পৃথক করতে গিয়ে দ্বৈতবাদীরা চেতনাকে জড় জগত থেকে এতটাই দূরে সরিয়ে দিয়েছেন যে, চেতনাকে আর এই জগতের বিষয় রূপে গণ্য করাই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, জড়বাদী তত্ত্বে আবার, চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন। এই চিন্তা, সার্লের মতে, দ্বিকোটিক বিভাজনের দ্বারা প্রভাবিত। কার্তেসীয় চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই দৈহিক দশা ও মানস দশাকে এমনভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা পরস্পর বর্জনকারী বিকল্প (mutually exclusive) রূপে স্বীকৃত হয়েছে। সার্ল মনে করেন, প্রাচীন এই দ্বিকোটিক বিভাজনই দেহ-মনের সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে। মানস দশা মাত্রই ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি সাপেক্ষ (first person perspective); আর ভৌতদশা ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ (objective), প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি সাপেক্ষ (third person perspective)। সার্ল তাই দেহ-মনের সম্বন্ধের জটিলতাকে সরল করার জন্য এই প্রথাগত বিভাজনকে বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

সার্ল চেতনাকে একটি প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন এবং সে কারণে চেতনার একটি প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, চেতনা একটি জৈবিক (biological) ঘটনা। অন্যান্য জৈবিক ঘটনার যেমন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা সম্ভব, চেতনারও তেমনই প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা সম্ভব। তাঁর মতে, চেতনা বা অন্যান্য চেতন মানস ক্রিয়া (ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা, যৌক্তিক চিন্তা প্রভৃতি) অন্যান্য জৈবিক ঘটনার মতোই জৈবিক ঘটনা, তার থেকে আলাদা কিছুই নয়; চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন একটি স্বাভাবিক সাধারণ জৈবিক ঘটনা। সার্ল এ প্রসঙ্গে চেতনাকে পাচনক্রিয়া, রেচনক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, জৈবিক বা শারীরিক বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যেভাবে মানব দেহে

রেচনক্রিয়া বা উদ্ভিদ দেহে সালোকসংশ্লেষ ঘটে, তেমনি মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে জৈবিক নিয়মে চেতনার উদ্ভব হয়। সার্ল এক্ষেত্রে চেতনার জৈবিক প্রাকৃতিক চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এখন, সার্ল বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেই চেতনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। একইসঙ্গে সার্ল দাবি করেন যে, ব্যক্তিনিষ্ঠতা বা বিষয়মুখিনতার মতো কিছু বৈশিষ্ট্য চেতনাতে বিদ্যমান, যারা কোনোভাবেই জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে, এমন কোনো বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, যা জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয়; অর্থাৎ এই জগতে এমন কোনো বস্তুর অস্তিত্ব আছে যা বিশুদ্ধভাবে ব্যক্তিনিষ্ঠ, কোনোভাবেই জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয়-- এমনটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তনীয়ই নয়। সুতরাং সার্লকে যদি বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে ব্যক্তিনিষ্ঠতার দাবী থেকে তাঁকে সরে আসতে হবে, না হলে বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডল বর্জন করতে হবে। এই দুটি পরস্পর বিরোধী অবস্থানের মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য সার্ল দু'ধরনের পর্যাবসানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন - (১) সত্তাগত পর্যাবসান (ontological reduction) ও (২) কারণিক পর্যাবসান (causal reduction) (Searle 2002, 113-114)।

সত্তাগত পর্যাবসানে দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে, একধরনের বস্তু প্রকৃতপক্ষে অন্য ধরনের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন, চেয়ার হল কতগুলি অনু-পরমাণুর সংগঠন। আণবিক সংগঠনের অতিরিক্ত তাতে আর কিছুই নেই। বিজ্ঞানের জগতেও এই পর্যাবসানই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। সার্ল মনে করেছেন, অন্যান্য সব পর্যাবসানের লক্ষ্যই হল সত্তাগত পর্যাবসান। অন্যদিকে, কারণিক ক্ষমতাযুক্ত দু'ধরনের বস্তুর মধ্যে যদি এমন সম্বন্ধ হয় যে, একজনের কারণিক ক্ষমতা অন্যজনের কারণিক ক্ষমতার দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রটিকে কারণিক পর্যাবসানের স্থল হিসেবে গণ্য করা যাবে। 'ক' জাতীয় ঘটনা, 'খ' জাতীয় ঘটনায় কারণিক দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্য হবে, যদি এবং কেবলমাত্র যদি 'ক' জাতীয় ঘটনার আচরণ সম্পূর্ণভাবে 'খ' জাতীয় ঘটনার আচরণের দ্বারা কারণিক দিক থেকে ব্যাখ্যাযোগ্য হয়। সার্ল উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। কঠিন বস্তুর কারণিক ক্ষমতা থেকে তার অভেদ্যতা (impenitribility) বা চাপ প্রতিরোধের ক্ষমতা প্রভৃতি নিঃসৃত হয়। কিন্তু এই কার্যক্ষমতাগুলি ঐ বস্তুর আণবিক গঠনের কারণিক ক্ষমতার দ্বারাও কারণিকভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। অর্থাৎ কঠিন পদার্থের কারণিক ক্ষমতা তার পরমাণুর আচরণের বা কার্যক্ষমতার অতিরিক্ত কিছুই নয়। তাই কঠিন পদার্থকে কারণিক দিক থেকে তার পরমাণুর কার্যক্ষমতায় পর্যাবসানযোগ্য বলে গণ্য করা যায় (Searle 2004, 119)।

বিজ্ঞানের জগতে সাধারণভাবে কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে সত্তাগত পর্যাবসান করা হয়ে থাকে। কোনো একটি ঘটনার ক্ষেত্রে যদি সফলভাবে কারণিক পর্যাবসান সম্ভব হয় তাহলে সেক্ষেত্রে খুব সহজেই ঐ ঘটনাকে তার কারণিক ভূমিকার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হয়। কারণিক ক্ষমতার সঙ্গে তাকে অভিন্নরূপে গণ্য করা হয়। যেমন, বর্ণ, উত্তাপ প্রভৃতি ধর্মের ক্ষেত্রে কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে সত্তাগত পর্যাবসান করা হয়ে থাকে। সার্ল বলেন, একটি বস্তুর কাঠিন্যকে যখন তার আণবিক গঠনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয় এবং দাবি করা হয় যে, কাঠিন্য বস্তুর আণবিক গঠনের অতিরিক্ত কিছুই নয়, তখন আণবিক গঠনের ভিত্তিতে কাঠিন্যকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এ প্রসঙ্গে সার্ল একটি বিষয়ের দু'ধরনের ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। উপরিতলের ধর্ম (surface feature) ও নিম্নস্তরীয় মূল কারণগত ধর্ম। তাঁর মতে, কাঠিন্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয় যেমন, তার অভেদ্যতা, চাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা এগুলিকে সার্ল উপরিতলের ধর্ম বা surface feature হিসেবে গণ্য করেছেন। বিজ্ঞান অনুসারে এই উপরিতলের ধর্মগুলি বাহ্যিক স্তরে পরিদৃশ্যমান হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি অন্তর্নিহিত নিম্নস্তরীয় আণবিক গঠনের প্রতিফলন মাত্র। কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে যখন সত্তাগত পর্যাবসান করা হয়, তখন এই উপরিতলের ধর্মকে এড়িয়ে গিয়ে নিম্নস্তরীয় মূল কারণের ভিত্তিতে ঐ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়।

এখন, চেতনাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যখন সার্ল বলেন যে, চেতনা হল স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা তখন সার্ল চেতনাকে যে স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনায় পর্যবসিত করেন, তাতে কোনো সংশয় নেই। সার্ল নিজেও সে কথা স্বীকার করেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, সার্ল কি তাহলে কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে চেতনার সত্তাগত পর্যাবসান স্বীকার করবেন?

সার্ল এই প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টতই বলেছেন যে, "... in case of consciousness we can make a casual reduction but we cannot make an ontological reduction without losing the point of having the concepts." (Searle 2004, 119) সার্লের মতে, স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার ভিত্তিতে চেতনার কারণিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে দেওয়া সম্ভব হলেও তার ভিত্তিতে বলা যায় না যে, চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক আচরণের অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। এই দাবির সপক্ষে সার্ল যুক্তি দিয়েছেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে চেতনাকে স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যেতেই পারে। ঠিক যেভাবে কাঠিন্য (solidity) বা তরলতার (liquidity) ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রগুলি ব্যতিরেকে, তাঁর মতে, ব্যক্তিনিষ্ঠতা (subjectivity), উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জ্ঞাত হবার যোগ্যতা (first

person subjectivity) প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি চেতনার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উপস্থিত থাকে, যা বস্তুনিষ্ঠভাবে (objectively) প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি (third person perspective) থেকে চেতনাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। এখানেই অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে চেতনার পার্থক্য। কাঠিন্য বা তরলতার ক্ষেত্রে তাদের উপরিতলের ধর্মকে উপেক্ষা করে নিম্নস্তরীয় মূল কারণের ভিত্তিতে পুনর্সংজ্ঞায়িত (redefine) করা সম্ভব হলেও চেতনার ক্ষেত্রে তা করা যায় না। চেতনাও সার্লের মতে, উপরিতলের ধর্মবিশিষ্ট, কিন্তু, তিনি মনে করেন, কাঠিন্যের ক্ষেত্রে উপরিতলের ধর্মকে উপেক্ষা করার মধ্যে কোনো অসুবিধা না থাকলেও, চেতনার উপরিতলের ধর্ম যেমন ব্যক্তিনিষ্ঠতা (subjectivity), বিষয়মুখিনতা (intentionality) প্রভৃতিকে উপেক্ষা করা যায় না, বরং চেতনাকে বুঝতে হলে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো সমন্বিত করেই তাকে বুঝতে হয় (Searl 2004, 119-20)।

এই জগতে কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব থাকার অর্থই হল ওই বিষয় বা বস্তুটির কোনো না কোনো প্রয়োজনীয়তা এই জগতে অবশ্যই আছে। বিবর্তনের ধারায় এই জগতে কেবলমাত্র সেইসব বস্তুরই আবির্ভাব হয়েছে যাদের কোনো না কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রশ্ন হল, কোনো বস্তুর প্রয়োজনীয়তা কীভাবে নির্ণীত হবে? যেকোনো বস্তুর প্রয়োজনীয়তাই এই জগতে তার কার্যক্ষমতার (কারণিক ভূমিকার) দ্বারা নির্নীত হয়। কোনো বস্তুর কার্যোৎপাদন সামর্থের ভিত্তিতেই তার প্রয়োজনীয়তা বিচার্য। সুতরাং সার্ল যদি মানস দশার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দাবি করেন তাহলে মনের স্বতন্ত্র কার্যোৎপাদন সামর্থ্যও সিদ্ধ করতে হবে।

এখন, মনের কার্যোৎপাদন সামর্থ্য বলতে কী বোঝায়? একটি মানস ঘটনা যদি অন্য একটি ঘটনাকে কারণের দিক থেকে প্রভাবিত করে তাহলেই বলা যাবে যে, মনের স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা আছে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মানস ঘটনার কারণিক ভূমিকা আছে বলেই অনুভব করি। আমার হাত তোলার ইচ্ছা হল, তাই আমি হাত তুললাম। ইচ্ছা একটি মানস ঘটনা। এই মানস ঘটনাটি আমার হাতের পেশী সঞ্চালনের কারণের ভূমিকা পালন করল। অতএব, মানস ঘটনার কারণিক ভূমিকা আছে। কিন্তু এই দাবি দার্শনিক জগতে গৃহীত হবে না। আমি যখন সচেতনভাবে আমার হাতটি তোলার চেষ্টা করছি তখন আমার ইচ্ছার পাশাপাশি আরও একটি ঘটনা ঘটল-- একটি নিছক শারীরবৃত্তীয় স্নায়ুতান্ত্রিক ঘটনা। আমার মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে আমার হাতের পেশিকে উদ্দীপিত করে সচল করল। ফলে, আমার হাত উত্তোলিত হল। সুতরাং, আমার হাত তোলার পিছনে যেমন আমার সচেতন ইচ্ছা কারণ, তেমনি আমার দেহের রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াও কারণ। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, একটি ঘটনার একাধিক কারণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি ঘটনার একাধিক কারণ স্বীকৃত নয়।

একটি ঘটনার দুটি পর্যাপ্ত কারণ থাকলে বিরুদ্ধ প্রাকল্পিক পরিস্থিতিতে (counter factual) কার্য থেকে কারণকে অনুমান করা সম্ভব হয় না। এই ত্রুটিই দর্শনের জগতে অতি নিয়ন্ত্রণের (causal overdetermination) সমস্যা হিসেবে পরিচিত।

বিজ্ঞানানুসারী মনোদার্শনিকরা পদার্থবিজ্ঞানকেই আদর্শ বলে মনে করেন। পদার্থবিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে, ভৌত জগত কারণিক দিক থেকে আবদ্ধ। ভৌত জগতের বাইরের কোনো কিছুর দ্বারা ভৌত জগত কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত হতে পারে না। ভৌত জগতের সব বস্তু এবং ঘটনার ভৌত ব্যাখ্যা (নীতিগতভাবে) দেওয়া সম্ভব। এই নীতি কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি বা 'principle of causal closure' নামে পরিচিত। জে. কিম কারণিক আবদ্ধায়নের নীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "If a physical event has of cause, it has physical cause. And if a physical event has an explanation, it has physical explanation." (Kim 2006, 199) ভৌতবাদীরা এই নীতিকে মেনে চলতে চান।

কারণিক আবদ্ধায়নের নীতির সঙ্গে আরও একটি নীতি উল্লেখ করা যেতে পারে যা পরিবর্জনের নীতি বা 'principle of causal exclusion' নামে খ্যাত। এই নীতি অনুযায়ী, কোনো একটি ঘটনার দুই বা ততোধিক পর্যাপ্ত কারণ থাকতে পারে না, যারা একই সময়ে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ কোনো একটি ঘটনার ক্ষেত্রে যদি ভৌত ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত হয় তাহলে অন্য কোনো (অভৌত) ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। এই নীতিই প্রকৃতপক্ষে কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণকে প্রতিহত করে।

সার্ল এই নীতিগুলি রক্ষা করে মানস কারণতা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সার্ল চেতনার সত্তাগত স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন, আবার তাকে কারণিক দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্য বলেও মনে করেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, দুটি বস্তু যদি স্বতন্ত্রই হয় তাহলে তাদের কার্যক্ষমতা অভিন্ন হয় কীভাবে? এই প্রশ্নের সম্ভাবনা সার্ল অনুভব করেছিলেন। সাধারণভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, দুটি বস্তু পৃথক হলে তাদের কার্যক্ষমতাও পৃথক হয়। কিন্তু সার্ল কাঠিন্য বা তরলতার দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, সব ক্ষেত্রে দুটি বিষয় স্বতন্ত্র হলেও তাদের কার্যক্ষমতা পৃথক হয় না। যেমন, জলের তরলতা তার আনবিক গঠনের আচরণের অতিরিক্ত নয়। একটি পেশাই যন্ত্রের কাঠিন্য তার আণবিক আচরণের অতিরিক্ত নয়। তেমনি তরলতা বা কাঠিন্যের কার্যক্ষমতাও তাদের আণবিক গঠনের কার্যক্ষমতার অতিরিক্ত নয়। সার্লের মতে, চেতনার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্বন্ধও জলের তরলতার সঙ্গে তার আণবিক আচরণের সম্বন্ধের মতো। কারণ তাঁর মতে, কাঠিন্য বা তরলতা প্রভৃতি একটি বস্তুর উপরিতলের ধর্ম যা সম্পূর্ণভাবে আণবিক গঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সার্ল এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বস্তুকে একেকটি তন্ত্র (system) হিসেবে গণ্য করেছেন যাদের দুটি করে স্তর আছে— একটি উচ্চস্তর (higher level) ও একটি নিম্নস্তর (lower level)।

সমগ্র তন্ত্রের কারণিক ভূমিকা এই নিম্নস্তরের কারণিক ভূমিকার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তাই, সার্লের মতে, প্রতিটি বস্তুই তার নিম্নস্তরীয় আণবিক গঠনের আচরণে কারণিকভাবে পর্যাবসানযোগ্য।

চেতনার ক্ষেত্রেও সার্ল একই কথা বলবেন। তাঁর মতে চেতনাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। হাত তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর একজন ব্যক্তি যখন হাত তোলে, তখন তার এই ক্রিয়াটি স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার ভিত্তিতেই ব্যাখ্যাত হতে পারে। স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার অতিরিক্ত কোনো কারণ সেখানে থাকে বলে সার্ল মনে করেন না। বরং তিনি মনে করেন যে, এক্ষেত্রে একটি সমগ্র তন্ত্রকে দুটি ভিন্ন স্তরীয় বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় মাত্র। হাত তোলার ঘটনাটিকে দু'ভাবে বর্ণনা করা যায়-- একটি হল, হাত তোলার ইচ্ছা হল তাই হাত উঠল, আবার মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক উদ্দীপনা পেশীর সঞ্চালন ঘটালো, তাই হাত উঠলো। সার্লের মতে, এই দুটি বর্ণনা ভিন্ন কারণের বর্ণনা নয় বরং একটি সমগ্র তন্ত্রের দুটি ভিন্ন স্তরীয় বর্ণনামাত্র ("…descriptions at two different levels of one complete system." [Searle 2004, 209])। তবে, কাঠিন্য বা তরলতার সঙ্গে চেতনার কারণিক পর্যাবসানযোগ্যতার তুলনা করলেও, সার্ল স্বীকার করেন যে, কাঠিন্য বা তরলতার সঙ্গে চেতনার পার্থক্য আছে। কাঠিন্য বা তরলতার মতো চেতনা কিন্তু কখনোই তার নিম্নস্তরে সত্তাগতভাবে পর্যাবসানযোগ্য নয়। চেতনার সত্তাগত স্বাতন্ত্র্য অবশ্য স্বীকার্য। চেতনার ব্যক্তিনিষ্ঠতা, উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জ্ঞাত হবার যোগ্যতা প্রভৃতি কেবলমাত্র চেতনাতেই থাকে এবং এগুলি কোনোভাবেই পর্যাবসানযোগ্য নয়। সার্লের মতে, চেতনার এই বৈশিষ্ট্যগুলি সত্তাগত স্তরে চেতনার পর্যাবসানহীনতা প্রমাণ করে।

সার্ল সত্তাগত স্তরে চেতনার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে চান, চেতনার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয় বলেও তিনি দাবি করেন। অর্থাৎ তিনি জড় জগত অতিরিক্ত চেতনার জগত স্বীকার করেন। ফলে, আপত্তি হতে পারে, তাঁর তত্ত্বও শেষাবধি তাহলে দ্বৈতবাদেই পর্যবসিত হয়। আবার, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে কারণিক অবদ্ধায়ণের নীতি রক্ষার তাগিদে তিনি চেতনার কারণিক পর্যাবসান স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ কারণিক দিক থেকে স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার অতিরিক্ত চেতনার অন্য কোনো কার্যকারিতা আছে বলে তিনি মনে করেন না। সেক্ষেত্রে চেতনাকে উপবস্তু বলে গণ্য করতে হয়, ফলে সার্লের তত্ত্বের বিরুদ্ধে উপবস্তুবাদের আপত্তিও ওঠে।

সার্ল ব্যক্তিনিষ্ঠতা, বিষয়মুখিনতার মতো কতকগুলি ধর্মের কথা চেতনার ক্ষেত্রে স্বীকার করেন, কিন্তু এই গুণগুলির যদি কোনো কারণিক ভূমিকা নাই থাকে, তাহলে চেতনার সত্তাগত অস্তিত্ব স্বীকার করার অর্থই থাকে না।

বিবর্তনের ধারায় কেবলমাত্র সেই সব বস্তুরই আবির্ভাব হয়েছে, যেগুলি নিজেকে কার্যকরী বলে প্রমাণ করতে পেরেছে। চেতনার কোনো কার্যকারিতা যদি না থাকত, তাহলে তা বিবর্তনের ধারায় বিলুপ্ত হয়ে যেত।

কার্যকারণ এমন একটি সম্বন্ধ, যা দুটি স্বতন্ত্র ঘটনার মধ্যে সংঘটিত হয়। সার্লের মতে, জড় আর চেতন হল একই মস্তিষ্কতন্ত্রের দুটি ভিন্ন ধর্মী বর্ণনা। এখন, চেতনা যদি কেবলমাত্র মস্তিষ্কের বর্ণনা মাত্র হয় তাহলে কি চেতনার সত্তাগত স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা যায়? আর যদি চেতনার সত্তাগত স্বাতন্ত্র্য নাই থাকে, যদি তা ভৌত স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র নাই হয়, তাহলে তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধই বা কীভাবে হতে পারে? সার্লের তত্ত্বের এইরকম বিভিন্ন সমস্যা এবং তাঁর তত্ত্বের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন সমালোচনাগুলি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সার্ল যখন চেতনাকে কাঠিন্য বা তরলতার মতো ধর্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন বা যখন তিনি দাবি করেন যে এই ধর্মগুলি উচ্চস্তরের ধর্ম এবং যে নিম্নস্তর থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে, তার অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য এই ধর্মগুলিতে আছে, তখন স্বভাবতই মনে হয় যে, সার্ল সাধারণ উৎপত্তির কথা বলছেন না। সাধারণভাবে একটি বস্তু যখন উৎপত্তি লাভ করে তখন তা' তার উপাদান কারণে উপস্থিত বৈশিষ্ট্যগুলিরই অধিকারী হয়। তার মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না, যা তার উপাদান কারণে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু সার্ল যখন বলেন যে, চেতনাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তার নিম্নস্তরীয় উপাদান কারণে থাকে না-- তখন বোঝা যায় যে, তিনি সাধারণ উৎপত্তির কথা বলছেন না।

দর্শনের জগতে উৎপত্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। উৎপত্তি লাভ করা বস্তুটির ধর্মটি যদি তার উৎপত্তির পূর্বেই তার মূলগত জড় উপাদান স্তরের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য হয় এবং তার ভিত্তিতে পূর্বাভাসযোগ্য হয়, তাহলে সেই সব ধর্মকে পরিণামমূলক ধর্ম (resultant property) রূপে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে, যদি কোনো ধর্ম অভিনব বা নতুন হয় অর্থাৎ কোনোভাবেই তার উৎপত্তির পূর্বে পূর্বাভাসযোগ্য না হয় এবং মূলগত স্তরের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাযোগ্যও না হয়, তাহলে সেই সব ধর্ম, উদ্ভূত ধর্ম (emergent property) রূপে চিহ্নিত হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে উদ্ভূত ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং সার্লের তত্ত্বে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সার্ল যখন চেতনার ক্ষেত্রে তার মূলগত স্নায়ুতান্ত্রিক স্তরের ধর্মের অতিরিক্ত ধর্মের কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি চেতনাকে উদ্ভূত ধর্ম রূপে গণ্য করেছেন। সার্ল নিজে উদ্ভব তত্ত্ব সমর্থনের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি দু'ধরনের উদ্ভূত ধর্মের কথা বলেছেন -- (১)Emergent-1 এবং (২) Emergent-2 । Emergent-1 বলতে তিনি সেই সব ধর্মকে

বুঝেছেন যেগুলি উদ্ভূত হলেও তাদের নিম্নস্তরীয় উপাদানের কারণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে ব্যাখ্যাযোগ্য। অর্থাৎ নিম্নস্তরীয় উপাদানের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য থাকলেও সেই সব বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নস্তরের কারণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য। কাঠিন্য বা তরলতার সঙ্গে এক্ষেত্রেও তিনি চেতনার তুলনা করেছেন এবং এদের emergent-1 রূপে গণ্য করেছেন। emergent-2 বলতে তিনি এমন ধর্মকে বুঝিয়েছেন, যে ধর্ম তার নিম্নস্তরীয় উপাদানের কারণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারাও ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। তাঁর মতে কোনো কিছুই emergent-2 হতে পারে না। কোনো কিছু emergent-2 হলে কার্যকারণের পরম্পরা সম্বন্ধের নীতিটিই (principle of transitivity of causation) বিঘ্নিত হবে বলে তিনি মনে করেছেন (Searle 2002, 111-2)। যদিও এই নীতি যে বিজ্ঞানেও সব সময় মেনে চলা হয়, এমন নয়। সার্ল কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি রক্ষার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত ধরে নিয়েছেন যে, চেতনা Emergent-2 হতে পারে না। সার্লের বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, তিনি আগে সিদ্ধান্ত স্থির করে পরে যুক্তি সাজিয়েছেন। কারণ কার্যকারণের পরম্পরা সম্বন্ধ যে বিজ্ঞান অধিকাংশ সময়ই মানে না তা তাঁর না জানার কথা নয়।

সার্ল ‘emergent-2’ স্বীকার না করলেও ‘emergent-1’ অবশ্যই মেনেছেন যাকে তিনি casually emergent system feature নামে অভিহিত করেছেন। সার্ল উক্ত casually emergent system feature-এর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, উদ্ভূত ধর্মের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই সেখানে উপস্থিত। সুতরাং, একথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে, সার্ল একজন উদ্ভব তত্ত্বের সমর্থক। চেতনাকে উদ্ভূত ধর্ম রূপে স্বীকার করে সার্ল দেখাতে চেয়েছেন যে, চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত একটি বিষয়, কারণ চেতনাতে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা স্নায়ুতন্ত্রে অনুপস্থিত। এখন সার্লের এই দাবী থেকে মনে হয় যে সার্ল বোধহয় দ্বৈতবাদী, যেহেতু তিনি স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত কোনো স্তর বা সত্ত্বা স্বীকার করেছেন। এই সমালোচনা থেকে মুক্ত হবার জন্য এবং কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি রক্ষার উদ্দেশ্যেই কারণিক পর্যাবসানের কথা বলেছেন; যদিও চেতনার সত্তাগত পর্যাবসান স্বীকার করেননি, যেহেতু ব্যক্তিনিষ্ঠতা বা বিষয়মুখিনতার মতো কিছু বৈশিষ্ট্য চেতনাতে উপস্থিত যা তার নিম্নস্তরীয় উপাদান কারণে পর্যাবসানযোগ্য নয়। ফলে, বলা যায় যে, সার্ল চেতনাকে উদ্ভূত ধর্ম রূপেই গণ্য করেছেন। তবে সার্ল উদ্ভবের ধারণাকে সার্বিক অর্থে গ্রহণ করেননি; সীমিত অর্থে সমর্থন করেছেন। সার্লের মতে উদ্ভূত ধর্মগুলি কেবলমাত্র তার মূলগত ধর্ম সন্নিবেশ এবং পরিবেশগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে জানা সম্ভব না হলেও ঐ ধর্ম সন্নিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তা জানা সম্ভব। এই লক্ষণ থেকেই একটা বিষয় স্পষ্ট, মূলগত ধর্মগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধের ভিত্তিতে উদ্ভূত ধর্মকে ব্যাখ্যা করা বা সেই বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব

বলেই সার্ল মনে করেন। অর্থাৎ সার্লের casually emergent system feature সর্বাত্মক অর্থে অভিনব বা পূর্বাভাস অযোগ্য নয়। কারণিক দিক থেকে উদ্ভূত ধর্ম সব সময় তার উপাদান কারণের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য। তাই কারণিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত ধর্মের পর্যাবসান স্বীকার করাও তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

এখন, সার্লের এই তত্ত্ব বিষয়ে আপত্তি উঠতেই পারে যে, সার্ল উদ্ভূত ধর্মকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যাই করতে পারেননি। যে ধর্মে কারণিক অভিনবত্ব নেই তাকে কি আদৌ উদ্ভূত ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করা যায়? কোনো একটি বিষয়ের স্বকীয় কার্যকারিতা তার সত্ত্বার পরিচায়ক। স্বতন্ত্র কার্যকারিতা যার নেই তার স্বতন্ত্র সত্ত্বা কি স্বীকার করা যায়? স্বতন্ত্র সত্ত্বা ভিন্ন কারণিক সম্বন্ধেই বা কীভাবে অংশগ্রহণ সম্ভব? সার্ল চেতনাকে উচ্চস্তরীয় ধর্ম রূপে স্বীকার করেছেন। উদ্ভূত ধর্ম মাত্রই উচ্চস্তরীয় ধর্ম, যা তার মূলগত উপাদান স্তর থেকে উদ্ভূত। এখন, মানসকারণতা প্রতিষ্ঠার অর্থ হল, মানস দশার অন্য একটি মানস দশা বা ভৌত দশার উপর কারণিক প্রভাবকে ব্যাখ্যা করা। ভৌত দশা থেকে যখন মানস দশার উদ্ভব হয়, তখন নিম্নস্তরের কারণের দ্বারা উচ্চস্তর প্রভাবিত হয় তখন একে উর্ধ্বমুখী কারণতার স্থল (upward causation) রূপে চিহ্নিত করা যায়। উচ্চস্তরীয় মানস দশা যখন নিম্নস্তরীয় ভৌতদশাকে প্রভাবিত করে তখন তাকে নিম্নমুখী কারণতার স্থল (downward causation) হিসেবে গণ্য করা হয়। আর কোনো একটি ভৌত দশা যখন অন্য একটি ভৌত দশা থেকে উৎপন্ন হয় বা কোনো একটি মানস দশা থেকে যখন অন্য একটি মানস দশা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সম-স্তরে যখন কার্যকরণ সম্বন্ধ ঘটে তখন তা সমস্তরীয় কারণতার স্থল (same level causation) হিসেবে বিবেচিত হয়। উদ্ভব তাত্ত্বিকরা নিম্নমুখী কারণতা সম্বন্ধের উপর জোর দেন। তাঁরা মনে করেন যে, মানস কারণতা ব্যাখ্যা করার জন্য নিম্নমুখী কারণতা ব্যাখ্যা করা খুবই প্রয়োজন।

দেহ-মনের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে নিম্নমুখী কারণতার সম্বন্ধ স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু জে. কিম তার 'Being Realistic about Emergence' (2006) প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, নিম্নমুখী কারণতার সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। তাই মানস কারণতা প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়। কিমের মতে যখন একটি ভৌত ধর্ম (ভ$_১$) থেকে একটি মানস ধর্ম (ম$_১$) উদ্ভূত হয়, তখন এদের মধ্যে প্রনির্ভরতার (supervenience) সম্বন্ধ স্বীকার করতে হয়। এখন যদি মনে করা হয় যে, ঐ মানস ধর্মটি (ম$_১$) দ্বিতীয় একটি মানস ধর্মের (ম$_২$) কারণ হয়, তাহলে মানতে হবে যে, ঐ দ্বিতীয় মানস ধর্মটিও আবার কোনো না কোনো ভৌত ধর্ম প্রনির্ভর। অর্থাৎ দ্বিতীয় একটি ভৌত ধর্ম (ভ$_২$) স্বীকার করতে হবে। যেহেতু আমরা প্রনির্ভরতার সূত্র অনুযায়ী জানি যে, ভৌত জগতের পরিবর্তন না হলে মানস জগতে পরিবর্তন হতে পারে না, তাই মানস ধর্ম স্বীকার

করলে তার পিছনে অবনির্ভর ধর্ম হিসেবে একটি ভৌত ধর্মের উপস্থিতি অবশ্য স্বীকার্য। উদ্ভবতাত্ত্বিকরা এক্ষেত্রে বলবেন যে, প্রথম মানস ধর্মটির (ম$_১$) প্রভাবে ভৌতস্তরে একটি পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে 'ভ$_২$' নামক একটি নতুন ভৌত ধর্ম সৃষ্টি হয় যা অবশ্যই নিম্নমুখী কারণতার স্থল হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত এবং ঐ 'ভ$_২$' নামক ভৌত ধর্ম থেকে 'ম$_২$' নামক মানস ধর্ম উৎপন্ন হয়। উদ্ভবতাত্ত্বিকরা এভাবে মানস কারণতা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও কিম দাবি করেন যে, এভাবে মানস কারণতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাঁর মতে, যদি একথা মেনেও নেওয়া হয় যে, দ্বিতীয় মানস ধর্মটির (ম$_২$) উৎপত্তির জন্য একটি ভৌত ধর্মের (ভ$_২$) প্রয়োজন, তাহলে বলা যায় যে প্রথম ভৌত ধর্মটি (ভ$_১$) থেকেই দ্বিতীয় ভৌত ধর্মটি (ভ$_২$) উৎপন্ন হয়েছে। মানস ধর্মকে (ম$_১$) আর দ্বিতীয় ভৌত ধর্মের (ভ$_২$) কারণ রূপে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজনই হয় না। ভৌত ধর্মই যেহেতু অন্য ভৌত ধর্ম উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত তাই অতিরিক্ত একটি মানস ধর্ম স্বীকার করলে তা অতিনিয়ন্ত্রণের স্থল (overdetermination) হিসেবে বিবেচিত হবে।

সার্ল চেতনাকে উদ্ভূত ধর্মরূপে গণ্য করলেও চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করতে চাননি। সেকারণেই তিনি চেতনাকে 'emergent-2' হিসেবে গণ্য করতে রাজি হননি। কারণ তিনি জানতেন, চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করলে তিনি অতিনিয়ন্ত্রণের দোষে অভিযুক্ত হবেন। সার্ল কোনোভাবেই বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলকে বর্জন করতে চাননি। বিজ্ঞানভিত্তিক ভৌতবাদের নীতিগুলিকে সামনে রেখে চেতনার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই অনুসারে দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। উদ্ভূত ধর্মের যদি স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা না থাকে, তাহলে দেহ-মনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা অর্থহীন হয়ে যায়। তাই দেহ-মনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উদ্ভূত ধর্মের স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা স্বীকার করা আবশ্যক। সুতরাং, আমাদের এমন কোনো উদ্ভবতত্ত্বের অনুসন্ধান করতে হবে যেখানে উদ্ভূত ধর্মের স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা স্বীকৃত হবে। সার্লের উদ্ভবতত্ত্বের সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে পঞ্চম অধ্যায়ে তার বিকল্প তত্ত্বের অনুসন্ধানে কার্ল পপারের উদ্ভবতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। সার্লের তত্ত্বের অপূর্ণতাগুলি পপারের তত্ত্বের দ্বারা পূরণ করা যায় কিনা, তা খুঁজে দেখাই আমার উদ্দেশ্য।

পদার্থবিজ্ঞান কারণিক নিয়ন্ত্রণবাদের পৃষ্ঠপোষক। কারণিক নিয়ন্ত্রণবাদ অস্বীকার করার অর্থ হল পদার্থবিজ্ঞানের নীতি অমান্য করা। পদার্থবিজ্ঞানের নীতির সঙ্গে যদি কোনো তত্ত্ব অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে সেই তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক অভিধায় ভূষিত হয়। বিজ্ঞান তথা দর্শনের জগতে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, পদার্থবিজ্ঞান স্বয়ং সম্পূর্ণ, অতএব, এই জগতের যাবতীয় ঘটনার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের (logical positivists) হাত ধরে দর্শনের জগতে

এই ধারণা দৃঢ় প্রোথিত হয়েছে যে, সব বিজ্ঞানসম্মত বাক্যই পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশযোগ্য, অর্থাৎ তাঁরা মনে করতেন যে, সব বিজ্ঞানকেই পদার্থবিজ্ঞানে পর্যবসিত করা সম্ভব। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ হারিয়ে গেলেও, তার দার্শনিক প্রভাব অব্যাহত। আজও দর্শন তথা সমগ্র বিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার প্রাণপাত করছে। সমস্যা হল, পদার্থবিজ্ঞানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে গণ্য করা হলেও, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে তা' অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। প্রশ্ন হল, পদার্থবিজ্ঞান যদি জগতের সব ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে না পারে, তাহলে পদার্থবিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা কি আর অক্ষুন্ন থাকে? পদার্থবিজ্ঞানের মিথ্যা সম্পূর্ণতার দাবি এড়িয়ে অন্যভাবে চিন্তা করা কি একেবারেই অসম্ভব?

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রসিদ্ধ দার্শনিক কার্ল পপার দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করার সময় পদার্থবিজ্ঞানের এই অসম্পূর্ণতা অনুভব করেন। পদার্থবিজ্ঞানের বিকল্প হিসেবে তিনি জীববিজ্ঞানকে বেছে নিয়েছিলেন। জীববিজ্ঞানও বিজ্ঞানের জগতের স্বীকৃত একটি ধারা। জীব জগত সম্পর্কিত যাবতীয় যুক্তিসম্মত তথ্য এবং তত্ত্ব জীববিজ্ঞান আমাদের প্রদান করে। পদার্থবিজ্ঞানও জীববিজ্ঞানের সত্যতা ও বৈধতা নিয়ে কোনো সংশয় প্রকাশ করে না। অথচ জীববিজ্ঞানের সাহায্যে এমন অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যা পদার্থবিজ্ঞানের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। পদার্থবিজ্ঞান যেসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ, অন্য কোনো বিজ্ঞান যদি তা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয় তাহলে সেই বিজ্ঞানের সাহায্যে ঐ ঘটনাটির ব্যাখ্যা কেন গ্রহণযোগ্য হবে না? রসায়ন বা জীববিজ্ঞানও তো জগতের অনেক বিষয়ে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। পদার্থবিজ্ঞানই যে সবসময় শেষ কথা বলবে এমন তো নাও হতে পারে। জীববিজ্ঞান জীব জগত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়, তাই পপার জীববিজ্ঞানের সাহায্যে চেতনাকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন।

পপারের তত্ত্ব থেকে মনে হয় যে, তিনি উদ্ভবতত্ত্বের সমর্থক। সার্লের মতো তিনি সীমিত অর্থে উন্মেষের বা উদ্ভবের ধারণাকে গ্রহণ করেননি। সার্বিক উন্মেষের ধারণাকেই তিনি সমর্থন করেছেন। উদ্ভূত ধর্মের স্বাধীন ও উপাদান কারণ অতিরিক্ত স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা থাকে বলেই তিনি মনে করেন, অর্থাৎ সার্লের মতো তিনি মনে করেননি যে, প্রতিটি উদ্ভূত ধর্মের কারণিক ভূমিকা তার উপাদান কারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

পপার বিবর্তনবাদী তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। এই জগতে বিবর্তনের ধারায় এমন অনেক বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে যেগুলি তার উপাদান কারণের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। এই জগতে মূল উপাদান যে জড়বস্তু — তা অস্বীকার করা যায় না। এই জড় উপাদানগুলির মধ্যে নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই পরবর্তীকালে আরো নানা পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে। আদি জড় জগতের উপাদান থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যৌগিক বস্তুর উৎপত্তি হয়েছিল।

তারপর হঠাৎই কোনো একদিন কোনো একটি বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এমন একটি বস্তুর (কোষ) আবির্ভাব ঘটল, যা নিজের মতো আরেকটি বস্তু উৎপাদনে সক্ষম। অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার ঘটলো। মূল জড় জগতের উপাদান থেকে যে কোনোদিন এই পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার ঘটতে পারে তা কোনোভাবেই প্রাণের সঞ্চার বা আবির্ভাবের আগে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। নতুন উদ্ভূত এই ধর্মের থেকে আরো নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হল। উপযুক্ত পরিস্থিতিতে সেই স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের মধ্যে 'চেতনা' নামক এক নতুন বিষয়ের আবির্ভাব ঘটল। এটিও অভিনব। কারণ চেতনার আবির্ভাবের পূর্বে চেতনা বিষয়ে কোনো পূর্বাভাস দেওয়াও সম্ভব ছিল না। পপার এই প্রতিটি অভিনব এবং পূর্বাভাস অযোগ্য দৃষ্টান্তগুলিকে উদ্ভবের স্থল হিসেবে গণ্য করেছেন (Popper & Eccles 1985)।

প্রাণীর জিনগত বিবর্তনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে পপার দেখালেন যে, জিনের মিউটেশন প্রাণীর আচরণের দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত হয়। তাঁর এই দাবি শুধুমাত্র কারণিক নিয়ন্ত্রণবাদকেই খন্ডন করল এমন নয়, কারণতার সম্বন্ধের একমুখী দিকনির্দেশকেও তা খণ্ডন করল। বিজ্ঞান চিরদিনই বিশ্বাস করে যে, কারণ থেকে কার্য উৎপন্ন হয় বলে, কার্য কেবলমাত্র কারণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ কখনোই কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কার্যকে উচ্চস্তরীয় একটি বিষয় রূপে গণ্য করে বলা যায় যে, কারণ থেকে কার্যের নিয়ন্ত্রণ উর্ধ্বমুখী কারণতার সম্বন্ধকেই প্রকাশ করে, কিন্তু কার্য থেকে কারণে নিম্নমুখী কারণতা (downward causation) কখনোই সম্ভব নয়। পপারের যুক্তি মেনে নিলে অর্থাৎ প্রাণীর আচরণের দ্বারা জিনের মিউটেশনের প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা স্বীকার করে নিলে নিম্নমুখী কারণতাও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাণীদেহের মৌলিক উপাদান হল কোষ। কোষের মধ্যে থাকে জিন বা ডি এন এ। প্রতিটি প্রাণীর মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জিন বা ডি এন এ-র দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তাই বিজ্ঞান প্রাণীর যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের কারণ রূপে জিন বা ডি এন এ-কে চিহ্নিত করে। জিনের দ্বারা প্রাণীর আচরণ নির্ধারিত হবে, এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আচরণ, যা জিনের দ্বারাই সৃষ্ট, তা যদি আবার নিম্নস্তরীয় জিনের মিউটেশনেই প্রভাব বিস্তার করে, তবে তা অবশ্যই নিম্নমুখী কারণতার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত বলে পপার মনে করেছেন (Popper 1978)।

বিজ্ঞান অবশ্যই জড় জগত অতিরিক্ত চেতনার অস্তিত্ব মানতে চায় না। কিন্তু পপার দাবি করেন যে, বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, যেখানে বিজ্ঞান নানা বস্তুর অস্তিত্ব প্রাথমিকভাবে স্বীকার না করলেও পরবর্তীকালে তাকে ভৌত জগতের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই প্রসঙ্গে পপার বলের (force) ধারণা কীভাবে বিজ্ঞানের জগতে এসেছে, তার দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, আজ যদিও বিজ্ঞান বলকে ভৌত জগতের বিষয় রূপে গণ্য করে, কিন্তু

চিরকাল তা করতো না। বলের ধারণা পদার্থ বিজ্ঞানের জগতে অনেক পরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বলের ধারণা জড় জগতের অন্যান্য বস্তু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পপারের দাবী হল, জড়জগতের অন্যান্য বস্তুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে বলের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যদি বলের ধারণাকে পদার্থবিজ্ঞান ভৌতজগতের বিষয় রূপে গণ্য করতে পারে, তাহলে চেতনাকে কেন পারবে না? তিনি বলের সঙ্গে চেতনার তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, বলের সঙ্গে চেতনার সাদৃশ্যই বেশি। তাই চেতনাকে ভৌতজগতের অন্তর্ভুক্ত করা যেতেই পারে (Popper, Lindahl and Arhem 1993)।

পপার দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, বিজ্ঞানে বলের যে বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকৃত, তার প্রায় সবগুলিই চেতনার ক্ষেত্রেও স্বীকার করা যায়। ফলে চেতনাকেও বলের মতোই একটি ভৌত ধর্ম রূপে স্বীকার করা উচিত। আমাদের মস্তিষ্কেও তড়িৎচৌম্বকীয় বলক্ষেত্রের (electro-magnetic force field) অস্তিত্ব আছে বলে বিজ্ঞান আজ বিশ্বাস করে। আমাদের মস্তিষ্ক স্থিত তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রকে পপার অচেতন মনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র ভৌতজগতের অংশরূপেই বিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাই তাকে মস্তিষ্কের অংশ রূপেই গণ্য করা হয়। পপারের মতে, এই তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে যেহেতু চেতনার বৈশিষ্ট্যও বর্তমান, তাই তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রকে পপার একই সঙ্গে ভৌত জগত ও চেতন-জগতের বৈশিষ্ট্য যুক্ত বলে মনে করেছেন। এই কারণেই, তাঁর মতে, এই তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র ভৌত ও চেতন জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পপার মনে করেছেন, স্নায়ুতান্ত্রিক জগত ও চেতনার মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অচেতন মন অর্থাৎ তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সরাসরি চেতন জগতের উপর ক্রিয়া করতে পারে না বা চেতন জগতও সরাসরি স্নায়ুতান্ত্রিক জগতকে প্রভাবিত করতে পারে না। এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে তড়িৎচৌম্বকীয় স্তরটি উপস্থিত থাকে। স্নায়ুতান্ত্রিক জগত, অচেতন জগতকে প্রভাবিত করে এবং অচেতন জগত আবার চেতন জগতকে প্রভাবিত করে। একই প্রক্রিয়ায় চেতন জগতও অচেতন জগতের মাধ্যমেই স্নায়ুতান্ত্রিক জগতকে প্রভাবিত করে। তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র চেতন বা অচেতন জগত হতে পারে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। তবে মস্তিষ্কে যে তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র কাজ করে সে বিষয়ে বিজ্ঞান নিশ্চিত। শুধু তাই নয় শারীরবিজ্ঞানের জগতে মস্তিষ্কস্থিত তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের মাধ্যমে চেতনাকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা হয়েছে (McFadden 2002)।

আমার উপসংহারে আমি দেখাতে চেষ্টা করব যে, সার্ল এবং পপার নিজের নিজের মতো করে চেতনাকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, যদিও উভয়েরই কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা চেতনাকে ব্যাখ্যার জন্য বা দেহ-মনের

সম্বন্ধকে বোঝার জন্যে এমন কিছু কথা বলেছেন, যা দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। সার্ল, পপার দু'জনেই একটি বিষয়ে একমত যে, স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকেই চেতনা উৎপন্ন হয় এবং মস্তিষ্কেই তা অনুভূত হয়। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব তাঁরা কেউই স্বীকার করেননি।

সার্ল বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে চেতনাকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, তাই স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত চেতনার কোনো কারণিক ভূমিকা তিনি স্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতে চেয়েছেন। সত্তাগত স্তরে চেতনার পর্যাবসান সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করেন। ব্যাক্তিনিষ্ঠতা বা বিষয়মুখিনতার মতো চেতনার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তিনি দাবি করেছেন যে, এগুলি কোনোভাবেই জড়জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয়। এই গুণগুলিই চেতনাকে অনন্য করে তুলেছে।

অন্যদিকে, পপার চেতনার উদ্ভবকে বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন। পদার্থবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা লক্ষ করে পপার জীববিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞান যে নিয়ন্ত্রণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে, তা যে সঠিক নয়, পপার বিবর্তনের তত্ত্বের সাহায্যে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, মানুষের সব আচার-আচরণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার জিনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু পপার দেখিয়েছেন যে, বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ করলে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, জীবের ইচ্ছা-অনিচ্ছা চাওয়া-পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই তার জিনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অর্থাৎ যে আচার-আচরণ জীবের জিনের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিল, সেই আচার-আচরণই আবার জিনকে প্রভাবিত করেছে, যা অবশ্যই একটি নিম্নমুখী কারণতার দৃষ্টান্ত। পদার্থবিজ্ঞান যে নিম্নমুখী কারণতাকে অসম্ভব বলে দাবি করে, পপার জীববিজ্ঞানের সাহায্যে তার সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করেছেন।

পপার বিজ্ঞানের পটভূমিতেই চেতনাকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। চেতনার সঙ্গে তিনি বলের সাদৃশ্য দেখিয়ে চেতনা ও ভৌতজগতের মধ্যে দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করেছেন। চেতনা যে অতিপ্রাকৃত কোনো বিষয় নয়, তা যে ভৌত জগত থেকে উৎপন্ন এবং অনেকাংশেই ভৌতজগতের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত, তাও পপার দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কার্তেসীয় দর্শনে দেহ ও মনের মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই কারণে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা দুরূহ হয়ে উঠেছিল, পপার সেই দূরত্ব কমিয়ে এদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পপার তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সাহায্যে দেহে-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান মানব মস্তিষ্কে তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের অবস্থান স্বীকার করে। পপার এই তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রকে চেতনা ও স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন, কারণ তাঁর মতে, ঐ তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি একাধারে যেমন চেতন গুণযুক্ত, তেমনি আবার ভৌত বৈশিষ্ট্য যুক্তও বটে। পপার স্নায়ুতান্ত্রিক জগত এবং তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের অতিরিক্ত একটি মনোজগত স্বীকার করেছেন এবং তার দ্রব্যসত্তা আছে বলে মনে করেছেন। বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে মনোজগতের দ্রব্যসত্তা কীভাবে দেখানো সম্ভব তা নিয়ে অবশ্য সংশয় থেকেই যায়।

সুতরাং, চেতনাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের মানতে হবে যে, তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রে স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার কোনো একটি পর্যায়ে একটি নতুন ধর্মের উদ্ভব হয় যাতে ব্যক্তিনিষ্ঠতা বা বিষয়মুখিনতার মতো কতগুলি বিশেষ গুণ থাকে, যা স্নায়ুতান্ত্রিক স্তরের অন্য কোনো কিছুতে থাকেনা। এই গুণযুক্ত নতুন উদ্ভূত ধর্মটি হল চেতনা। চেতনাবিশিষ্ট তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে বাহ্য জগত থেকে আগত ভৌতধর্মবিশিষ্ট তথ্যগুলি সমবেত হয় বা কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভাষায় বললে ‘আপলোডেড’ হয়। ঐ তথ্যগুলি ভৌতধর্মবিশিষ্ট, কারণ তাতে চেতনা যুক্ত থাকে না। নিছক কতগুলি উদ্দীপনা তড়িতায়ন রূপে স্নায়ুকোষের মাধ্যমে বাহিত হয়ে মস্তিষ্কে উপনীত হয়। তারপর সেগুলি চেতনাবিশিষ্ট তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রে যখন সংশ্লেষিত হয় তখন চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তার পরেই ভৌত জগত থেকে প্রাপ্ত ভৌত উদ্দীপনা চেতন প্রতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং বহিস্থ স্নায়ুতে ‘ডাউনলোড’ হয়ে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফিরে যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি যে, চেতনা একটি উদ্ভূত ধর্ম যা স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ স্তরে উদ্ভূত হয়, যদিও স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে তা স্বতন্ত্র একটি বিষয়। তার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা থাকে। তা প্রত্যক্ষভাবে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধে যুক্ত হয় এবং তাকে প্রভাবিত করে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে চেতনা যদি স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র হয় তাহলে কি তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্বীকার করা সম্ভব? দেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এই আপত্তিটিই ওঠে। দেহ এবং মন যেহেতু দেকার্তের মতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের অধিকারী, তাই তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। আমাদের তত্ত্বের বিরুদ্ধেও সেই একই আপত্তি উঠতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল, চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র হবার অর্থ, চেতনায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা স্নায়ুতান্ত্রিক ধর্মতে নেই। পপার আমাদের দেখিয়েছেন যে, বলের সঙ্গে চেতনার অনেক সাদৃশ্য

আছে। ভৌত জগতের সঙ্গে অনেক বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বলকে যেমন ভৌত জগতের বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তেমনি চেতনাকেও ভৌত জগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিরুদ্ধ সত্ত্বা হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে না। সার্লকে অনুসরণ করে, আমাদের মানতে হবে যে, চেতনা প্রাকৃতিক জগতেরই একটি বিষয়; একথা সত্য যে তার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা এই জগতের অন্য কোনো বস্তুতে নেই, কিন্তু এমনও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাকে প্রাকৃতিক জগতের কিছু বস্তুর (যেমন-বল) সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তোলে। সে কারণেই তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। চেতনা কোনো অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত সত্তা নয়, তাই চেতনার সঙ্গে অন্যান্য প্রাকৃত বস্তুর কার্যকরণ সম্বন্ধে বাধা থাকার কথা নয়।

এখন, প্রশ্ন হল, চেতনার সঙ্গে ভৌতজগতের যেসব বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সাদৃশ্য আছে সেগুলি তো সবই ভৌত বৈশিষ্ট্য, তাই, চেতনা প্রাকৃতিক বস্তু হিসেবে যখন ভৌত-স্নায়ুতান্ত্রিক ধর্মের উপর ক্রিয়া করে তখন কি তা মানসধর্মাবচ্ছিন্ন রূপে করে, নাকি ভৌত ধর্মাবচ্ছিন্ন রূপে করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে অন্তর্মুখী স্নায়ু (sensory neuron) দ্বারা বাহিত তথ্য মস্তিষ্কে সংশ্লেষিত হবার পর যখন বহির্মুখী স্নায়ুর (motor neuron) মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপে ফিরে আসে তখন ঐ প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে ব্যক্তিনিষ্ঠতার বোধ আমরা অনুভব করি। বাহ্য জগতের থেকে পাওয়া তথ্যে এই উপাদানটি থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং, স্বীকার করতে হবে যে, মস্তিষ্কে এই তথ্যটি সংশ্লেষিত হবার কোনো একটি পর্যায়ে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতএব, আমরা দাবি করতেই পারি যে, চেতনা মানসধর্মাবচ্ছিন্ন রূপেই স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

বিজ্ঞান হয়তো বলতেই পারে যে, চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার না করেও তো এই জগতের সব ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারছে, তাহলে আবার চেতনা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তাই বা কী? এর উত্তরে বলা যায় যে, একথা সত্য যে, বিজ্ঞান হয়তো এই জগতের বিভিন্ন ঘটনার জড় ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম, কিন্তু তারপরেও এমন অনেক বিষয় থেকে যায়, যেগুলিকে নিছক বস্তুবাদী যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যায় না, অথচ সেগুলিকে উপেক্ষা করাও যায় না। যেমন, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা প্রভৃতি। মানব জীবনের সবকিছু যদি নিছক যান্ত্রিক স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হয়, তার অতিরিক্ত যদি সেখানে কিছু নাই থাকে তাহলে, মানুষের কোনো কাজের নৈতিক বিচার সম্ভব হয় না। মানুষের বিভিন্ন অভিনব চিন্তা, তাদের উদ্ভাবনী শক্তি বা সৃজনশীলতার প্রকাশ, মানব সভ্যতার বিবর্তনে যা স্পষ্টতই প্রতিফলিত হয়, তাকেও অস্বীকার করতে হয়। যান্ত্রিক কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে অভিনবত্বের প্রসঙ্গই অর্থহীন, বিচার বিবেচনা বা দায়িত্ব-কর্তব্যের বোধও যন্ত্রের মধ্যে থাকতে পারে না, তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করলে, এগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না, ফলে, এদের বর্জন

করতে হয়। কিন্তু মানব জীবনের ক্ষেত্রে এগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বিজ্ঞানকে বুঝতে হবে যে, যে নীতিগুলিকে বিজ্ঞান আদর্শ বলে মনে করেছে, সেগুলিই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে। চেতনাকে প্রাকৃতিক বস্তু হিসেবে গণ্য করে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনার আওতাধীন করা যায় কিনা, তা বিজ্ঞানকে ভেবে দেখতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

- Kim, J. (2006), 'Being Realistic about Emergence' in *The Reemergence of Emergence*; P. Clayton and P. Davis (eds.), 189-202. Oxford : Oxford University Press.
- McFadden, J. 2002. The Conscious Electromagnetic Information (Cemi) Field Theory : The Hard Problem Made Easy? *Journal of Consciousness Studies.* 9(8) : 45-60.
- Popper, K. R. (1978), 'Natural Selection and Emergence of Mind', *Dialectica*, vol.-32, no. 3-4.
- Popper, K. R., Eccles J. C. (1985), *The Self and its Brain*, London : Springer International.
- Popper, K. R., Lindahl, B.I.B., Arhem, P. (1993), 'A Discussion of the Mind-Body Problem', *Theoretical Medicine*, 14, 167-180.
- Searle, J. R. (2002), *The Rediscovery of the Mind*, Cambridge, MA : MIT Press.
- Searle, J. R. (2004), *Mind : A Brief Introduction*, Oxford : Oxford University Press.